Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 378–384
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

বিস্মৃতির মাঝে শিশু সাহিত্যিক সুখলতা রাও

রিম্পা মাইতি
ইমেল : maity.rimpa87@gmail

Keyword
শিশু, সাহিত্য, সুখলতা রাও, ছবি, গল্প, রূপকথা, কবিতা, ছড়া, অনুবাদ, মৌলিক।

Abstract
ছড়াকার সুকুমার রায়ের সহোদরা ও চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের পিসি হলেন বিশিষ্ট শিশু-সাহিত্যিক ও সমাজসেবক সুখলতা রাও। সুখলতা রাও, ডাক নাম হাসি। ১৮৮৬ সালের ১০ই অক্টোবর, কলকাতার ১৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন হাসি ওরফে সুখলতা। তাদের আদি বাড়ি ছিল বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহের মসুয়ায়। সুখলতার পিতা বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী, যন্ত্রকুশলী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তাঁর মা বিধুমুখী দেবী ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক, ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা। সুখলতা রাও কলকাতায় ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় এবং বেথুন কলেজ থেকে ব্যাচেলার ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯০৭ সালে উড়িষ্যার জয়ন্ত রাও-এর সাথে কটকে চলে যান। কটক যাওয়ার পর তিনি সেখানে 'শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র', 'উড়িষ্যা নারী সেবা সংঘ' প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সমাজসেবার পাশাপাশি তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে 'আলোক' নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন।

সুখলতার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'গল্পের বই' (১৯১২)। তারপর একে একে প্রকাশ পেয়েছে 'আরো গল্প' (১৯১৫), 'পড়াশুনা' (১৯২১), 'নতুন পড়া' (১৯২২), 'বেহুলা' (১৯৩৩) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য রচনা। 'নূতন ছড়া' (১৯৫২), 'নিজে পড়' (১৯৫৬), 'নিজে শেখ' (১৯৫৭), 'আলিভুলির দেশে' (১৯৫৭), 'নানান গল্প' (১৯৬৩), খেলার পড়া (১৯৬২), 'খোকা এল বেরিয়ে' (১৯৬১), 'ঈশপের গল্প' (১৯৬৩), 'হিতোপদেশের গল্প' (১৯৬৫), 'কিশোর গ্রন্থাবলী' (১৯৬৬) প্রভৃতি রচনাগুলি এই পর্বের সৃষ্টি।

একদিকে প্রাচীন পুরাণ-কথা-রূপকথা, লোককথার সংগ্রহ-সংকলণ, অনুবাদ। অন্যদিকে অভিনব মৌলিক বিষয় ও ভাবনায় সংযোজন, সব মিলে সুখলতার সাহিত্যসৃষ্টির ধারাটি ছিল গতিশীল, প্রাঞ্জল ও সমৃদ্ধ। ১৯০৬-০৭ সালে কলকাতায় ভারতী কৃষি ও কারিগরী প্রদর্শনীতে তিনি তেল রং বিভাগে পদক পান। ১৯১০ সালে ইলাহাবাদে ইউনাইটেড প্রভিনেন্সের (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) প্রদর্শনীতে জল রং বিভাগে পদক জেতেন। ওই বছরই প্রবাসীতে ছাপা হয় সুখলতার আঁকা 'পূজারিণী', পরের বছর 'সাবিত্রী'।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটক ও 'জাপান যাত্রী' ভ্রমণ পত্রাবলীর অনুবাদ করেছিলেন তিনি যথাক্রমে 'Devouring Love' ও 'A Visit to Japan' নামে। নিউইর্য়ক থেকে অনুবাদ দুটি প্রকাশ হয়েছিল রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর (১৯৬১) লগ্নে ও 'East-West Institute Series'-এর বই হিসাবে। তাঁর 'নিজে পড়' গ্রন্থটি শিশুসাহিত্য সংসদ কর্তৃক

প্রকাশিত হয় এবং এরজন্য তিনি 'লেখিকা' পুরস্কার লাভ করেন। সমাজসেবায় অবদান রাখার জন্য তিনি স্বামীর সঙ্গে যৌথভাবে 'কাইজার-ই-হিন্দ' পদক লাভ করেন।

এই বহুমুখী প্রতিভা ১৯৬৯-এ ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আজীবন তিনি সাহিত্য চর্চা করেছেন। শিশুসাহিত্যের বিষয়, বক্তব্য ও আঙ্গিক নিয়ে ভেবেছেন। শিশুর বিকাশের স্তরে তার শারীরিক, মানসিক গঠনের কথা আলোচনা করেছেন তিনি। বিচিত্র তাঁর রচনাসম্ভার। সাহিত্যের পাশাপাশি সমাজ ও সংসারের দায়িত্ব পালন করেছেন যথাযথভাবে।

Discussion

একজন বাঙালি সাহিত্যিক ও সমাজসেবী যিনি ১৮৮৫ সালের ২৩শে অক্টোবর, কলকাতার বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর বড় মেয়ে বলে নন, সুকুমার রায়ের দিদি বলে নন, সুখলতা তাঁর বহুমুখী কাজকর্ম আর লেখালেখির জন্য সাহিত্য, শিশুশিক্ষা আর নারী জগতের ইতিহাসে স্বমহিমায় উজ্জ্বল। সুখলতা রাও কলকাতার ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে, সেখানে থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে ভর্তি হলেন বেথুন কলেজে। বৃত্তি পেয়ে এফ.এ পাশ করেন। তবে বি.এ পরীক্ষাটা শেষ পর্যন্ত সুখলতার দেওয়া হয়নি। কারণ এই সময়ে অর্থাৎ ১৯০৭ সালে উড়িষ্যা নিবাসী সুখ্যাত ডাক্তার জয়ন্ত রাওয়ের সাথে তাঁর বিবাহ হয়।

উপেন্দ্রকিশোর ও বিধুমুখীর প্রথম সন্তান সুখলতার জন্ম ১৮৮৬ সালে। 'সুখলতা' এই নামকরণটির মধ্যেই উপেন্দ্রকিশোর সেই আমলের গতানুগতিক নামকরণের ধারা থেকে সরে এসে নিজ স্বকীয়তা বজায় রেখে ছিলেন। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৮৮৭ তে সুকুমারের জন্ম। সেই বছরই বেরোল রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাস। সুখলতা ও সুকুমারের ডাক নাম তাই স্থির হল হাসি আর তাতা। গান, বেহালা, সেতার, পিয়ান, অর্গ্যান, ছবি আঁকা– সন্তানদের জন্য সবরকম শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। সুখলতা বলতেন–

> "আমার সব প্রেরণার মূলে ছিলেন তিনি। গান, বাজনা, বেহালা, সেতার, পিয়ানো, অর্গ্যান বাজানো, ছবি আঁকা কত রকম শিক্ষার কত ব্যবস্থা করেছিলেন আমাদের জন্য।"[১]

সুখলতা রাওরা ছিলেন মোট ছ'ভাইবোন– সুখলতা, সুকুমার, পুণ্যলতা, সুবিনয়, শান্তিলতা, সুবিমল। তার সঙ্গে কাদম্বিনীর ছেলেমেয়েরা আর এবং রামচন্দ্র বিদ্যারত্নের মেয়ে সুরমা (লীলা মজুমদারের মা) এঁরা একসঙ্গে বড় আনন্দের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছিলেন।

সুখলতা পাঁচ-ছয় মাস বয়সেই ১৩ নম্বর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের (বর্তমান বিধান সরণি) বাড়িতে উঠে আসে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সংসার। তিনতলা বাড়ির বাইরের দিকে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়। ভিতরে বসতবাড়ি। প্রথমে থাকতেন তিনতলায়। সুখলতা লিখেছেন–

> "খাবার ঘরের সামনের বারান্দায়, কার একটা পোষা চন্দনা খাঁচায় ঝোলানো থাকত। খাঁচার শিকগুলো ছিল ফাঁক ফাঁক। বাবা খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে টুংটুং করে বেহালার তারে সুর বাজাতেন।"[২]

লম্বা বারান্দায় প্রায়ই বসত ম্যাজিক, ছায়াছবি, হাসি-কৌতুকের আসর। পরবর্তী জীবনে সুখলতা রাও ছোটদের জন্য সেইসব হাসিখেলার আয়োজনের ধারাটি বজায় রেখেছিলেন।

সুখলতা ছোটবেলায় থেকেই ছিলেন একটু গম্ভীর প্রকৃতির। পুণ্যলতা দেবী লিখেছেন– 'দিদি সবার বড় আর খুব শান্তশিষ্ট প্রকৃতির ছিলেন। ছেলেবেলায় তিনি দিদিকে কখনও চেঁচামেচি করতে কিংবা হুড়োহুড়ি করে খেলতে দেখেননি'। কল্যাণী কার্লেকর 'আমার মাসিমা সুখলতা রাও' নিবন্ধে লিখেছেন–

> "স্বভাবে তিনি সব ভাইবোনের থেকে একটু আলাদা ছিলেন, অন্যেরা সেখানে হাসি-খুশিতে উচ্ছল সেখানে তিনি শান্ত, গম্ভীর ও রাশভারি ছিলেন।"[৩]

লীলা মজুমদারের বর্ণণায় সুখলতা সেই মেয়ে, যাঁর সিংহীর মতো মনের জোর, অথচ আরশোলা দেখলে অজ্ঞান। এই হেন সুখলতা রাওকে একবার কী কারণে বকেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। বলেছিলেন–

"তুমি বেরিয়ে যাও আমাদের বাড়ি থেকে, আমরা তোমাকে চাইনা।"[৪]

তিনি কেবলমাত্র নিজেকে অপরাধী ভেবে হাত দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

"বালা দুটো কি রেখে যাব?"[৫]

"বাবা হেসে ফেললেন, আমাকে কোলে তুলে নিলেন, তার চোখে বুঝি জল এসে গিয়েছিল।"[৬]

১৯০৭ সালে তাঁর বিয়ে হয় কটকের বিখ্যাত ডাক্তার জয়ন্ত রাওয়ের সঙ্গে। জয়ন্তর বাবা মধুসূদন রাও ছিলেন ওড়িশার ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের পুরোধা, কবি ও লেখক। বাংলায় 'বর্ণপরিচয়' ওড়িয়া ভাষায় তেমন মধুসূদনের লেখা 'বর্ণবোধ', 'শিশুবোধ'। ওড়িয়া সমাজ তাঁকে 'ভক্তকবি' বলে। সুতরাং সুখলতা পিতৃগৃহে যেভাবে মানুষ হয়েছিলেন, বিয়ের পরও অনুরূপ একটি আলোকিত পরিবেশই পেলেন। একদিকে সিভিল সার্জেন স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে তাঁর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রটি হয় প্রসারিত। সেই সঙ্গে তাঁর আঁকা এবং সাহিত্য কর্মে জয়ন্তর পূর্ণ সহযোগিতা সুখলতা পান। বরং বিবাহ সূত্রেই বাংলা, ইংরেজির পাশাপাশি ওড়িয়া সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর পরিচয় স্থাপন এবং বাংলা-ওড়িয়া মেলবন্ধনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পেরেছিলেন সুখলতা। কটকে তিনি 'শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র', 'উড়িষ্যা নারী সেবা সংঘ' প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

উপেন্দ্রকিশোর নিজে ছবি আঁকতেন। ছেলেমেয়েদের মধ্যে আঁকার নেশাটি ধরিয়েছিলেন তিনি। লেখারও আগে আঁকার জন্য পরিচিতি পেতে শুরু করেছিলেন সুখলতা। ১৯০৬-০৭ সালেই কলকাতায় ভারতীয় কৃষি ও কারিগরি প্রদর্শনীতে তিনি তেল রং বিভাগে পদক পান। ১৯১০ সালে ইলাহাবাদে ইউনাইটেড প্রভিনেন্সের (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) প্রর্দশনীতে জল রং বিভাগে পদক জেতেন। ওই বছরই প্রবাসীতে ছাপা হয় সুখলতার আঁকা 'পূজারিণী' পরের বছর 'সাবিত্রী'।
তৈলচিত্রে মানুষের প্রতৃকৃতি আঁকার শখ তাঁর পূরণ হয়নি। কারণ মহিলা হিসাবে কারও কাছে কারিগরি ও প্রয়োগ-কৌশল শেখার সৌভাগ্য সেই সময় ছিল না। পাশের ঘরে তরুণ ইতালি শিল্পী শশিকুমার হেশ থাকলেও সে বিদ্যা আয়ও করার অধিকার হয়নি তাঁর।

আজও বাঙালিরা সুখলতাকে মনে রেখেছে। সাহিত্য জগতে পদার্পণ করার আগে থেকেই তিনি হাতে নিয়েছিলেন তুলি। 'প্রবাসী' পত্রিকাতে হয়তো তিনিই প্রথম মহিলা যাঁর আঁকা ছবি ছাপা হয়। বাংলার প্রথম শিল্পী এবং একই সঙ্গে লেখিকা হওয়ার কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য অর্থাৎ সচিত্র গল্প লিখে ওঁর আগে কেউ ছাপাননি।

১৯১২ তে যখন তাঁর প্রথম বই বেরোয় তাতে ছিল নিজের হাতে আঁকা বাচ্ছাদের জন্য সব সাদা কালো ছবি। ১৯২০ অবধি নিজেই আঁকতেন বইয়ের ছবি। ক্রমশ তা হারিয়ে যায় হয়তো পেশাগত শিল্পীদের চাপে। শেষ ছবি আঁকেন বাচ্ছাদের জন্য ১৯৩০ এর পর। সে বইটি নানা কারণে খুবই ব্যতিক্রমী। এটি তাঁর একমাত্র বই যাতে ওঁর আঁকা রঙিন ছবি দেখা যায়। সুখলতার রাও-এর ছবিতে যে বিদেশি প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সেই কৌশল তিনি তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কাছেই শিখেছিলেন। বিষয় ও আঙ্গিক দুদিক থেকেই বিচার করলেই তা সুদৃশ্য ভাবে বোঝা সম্ভব।

১৯১২ সালে সুখলতার প্রথম বই 'গল্পের বই' প্রকাশিত হয়। কুড়িটি ভিনদেশি রূপকথাকে সেখানে বাংলার ছেলেমেয়েদের উপযোগি করে উপস্থাপন করেছেন তিনি। ভারতীতে সেসম্পর্কে লেখা হয়েছিল–

> "গল্পগুলি টাটকা ফুলের মতোই সুন্দর, উপভোগ্য, লেখিকার ভাষাটি ও বেশ সহজ– তাহাতে একটি সুর আছে – সুরটুকু একেবারে গিয়া প্রানের তারে আঘাত দেয়, ...গ্রন্থে অনেকগুলি সুন্দর ছবি আছে। সেগুলি আবার গ্রন্থকর্ত্রীর স্বরচিত। বঙ্গনারীর হস্তে এমন চিত্র রচিত হয় –ইহা দেখিয়া শুধু আনন্দে নহে গৌরবে ও আমাদিগের চিত্ত ভরিয়া ওঠে।"[৭]

রবীন্দ্রনাথ খুবই পছন্দ করতেন সুখলতার ছবি। 'সন্দেশ' –এ তার কবিতার জন্যও ছবি একেছেন সুখলতা। আবার সুখলতা যখন ইংরাজীতে 'বেহুলার গল্প' অনুবাদ করলেন, সঙ্গে ছবি- বইয়ের ভূমিকা লিখে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তীতে কবির শতবর্ষে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'রাজা ও রাণী' এবং 'জাপান যাত্রী' র ইংরাজি অনুবাদ সুখলতারই করা। 'ডিভায়েরিং লাভ' এবং 'আ ভিজিট টু জাপান'।

ছোটদের লেখার ক্ষেত্রে সুখলতার বিচরণ ছিল নানা শাখায় – মৌলিক গল্পে ('দুই ভাই, 'খোকা এল বেরিয়ে', 'আলি ভুলির দেশে'), অনুবাদ গল্প (নানান দেশের রূপকথা', 'গল্প আর গল্প', সোনার ময়ূর') কবিতা ('নূতন ছড়া', 'বিদেশি ছড়া'), গল্প, নাটক ('বনে ভাই কত মজাই', বীর হনুমান', আজবপুর', 'পাখির দেশ', পাঠ্যপুস্তক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিবন্ধ প্রভৃতি।

সুখলতা রাও কেবলমাত্র ছোটদের জন্য শুধু গল্প বা ছড়া লিখে ক্ষান্ত হননি। সারাজীবন ধরে শিশু শিক্ষার উপযোগি নানা ধরনের বই লিখেছেন। শুধুমাত্র বর্ণ শিক্ষার বই জন্যই সাতটি বই লিখেছেন সুখলতা। এ বিষয়ে তার প্রথম বই পড়াশুনা' প্রকাশিত হয় ১৯১৭সালে। এছাড়া লিখেছেন 'স্বাস্থ্য' (১৯২২), 'নূতন পড়া' (১৯২২), 'নিজে পড় (১৯৫৬), 'নিজে লেখ' (১৯৬৭) ইত্যাদি।

সুখলতা দেবী শুধু ছোটদের সাহিত্য কেমন হওয়া উচিত বা উচিত নয় এ বিষয়েও তিনি যথেষ্ট ভেবেছেন। তিনি চাইতেন– শিশু সাহিত্য নির্মল হবে। তাতে কোন মন্দ ভাবের প্রশ্রয় বা গুরুজনদের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব থাকবে না। কারও প্রতি বিদ্বেষের বা অবজ্ঞার ভাব থাকবে না। 'শিশু সাহিত্যে সুরুচি' প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন–

> "শিশু সাহিত্যের ভিতর দিয়া শিশুর সরল মনের যে ছবি, যে শিক্ষা যে আদর্শ পৌছায়, তাহা তাহার অজ্ঞাতসারে সেখানে নিজের ছাপ রাখিয়া যায়, এবং ভবিষ্যতে তাহার শিক্ষা দীক্ষা, এমনকি রুচির উপরে প্রভাব বিস্তার করে।"[৮]

শুধু বইপড়া নয়, ছোটদের নিয়ে নাচগান, নাটক করানোর উপাদানের কথাও সুখলতা সমান গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন। পারিবারিক জীবনে এমন অনেক খেলা-নাটিকা ইত্যাদি তিনি ছোটদের দিয়ে করিয়েছেন। কল্যানী কালেকরের লেখায় তার বিবরণ পাই– পর্দার পিছনে আলো দিয়ে কাগজের পুতুল নাড়ানো হত। তার ছবি পর্দায় ফুটে উঠত চলচ্চিত্রের মতো। সাবান জল দিয়ে বড় বুদবুদ তৈরী করে মোমবাতি আর ছবির মাঝে বসানো হত। মোমের আলো বুদবুদের মধ্য দিয়ে গিয়ে ছবির উপর রামধনু তৈরী করত। ছোটরা ভারী মজা পেত। কল্যানী লিখেছেন,

> "আমাদের খেলার সঙ্গিনী মাসিমার সঙ্গে লোক প্রসিদ্ধির রাসভারি সুখলতা রাওয়ের কোন মিল ছিলনা।"[৯]

তাছাড়া শিশুদের দিয়ে তিনি অনেক রকম আনন্দানুষ্ঠান করিয়ে নিতেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়–

> "গুটিপোকা থেকে প্রজাপতির জন্ম। বারান্দার শেষ দিকে লম্বা দড়ি বেঁধে তার থেকে পাশাপাশি একসারি কোচান কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া হত– ওপর দিকটা বড়ো করে দড়ির সঙ্গে বাঁধা আর নিচটা খোলা। এককেজন মেয়ে এককেটা শাড়ির ঘেরাটোপের মধ্যে দাঁড়াতেন– তারা সব গুটি পোকা।"[১০]

তারা সবাই দুলে দুলে গান গাইত– "পরাণ পুলকিত দেহমন চমকিত, / আজি কোন শুভক্ষনে ভাঙিল এ ঘুমঘোর।"[১১]

সুখলতার লেখায় - ভাবনায় সামগ্রিক ভাবে ওড়িশা সংস্কৃতি অনেকটা জায়গা করে নিয়েছিল। সেখানকার প্রচলিত বহূ ছড়া গান সুখলতা অনুবাদ করে বাংলা শিশু সাহিত্যের পরিধিটি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার একটি সম্পূর্ণ প্রবন্ধই আছে 'উড়িয়া ছড়া' নামে। ১৯৫২ সালে কটকে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে তার যে অভিভাষণ তারও বিষয় ওড়িয়া শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস, বাংলার সঙ্গে তার সাদৃশ্য এবং পারস্পরিক আদান–প্রদানের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সাহিত্য প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট হওয়াটা দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক।

সুখলতার মননে আসলে ব্রাহ্ম মূল্যবোধের ভূমিকা অপরিসীম। বৃহতের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্গাটি তার অন্তর্গত। সুখলতা উপেন্দ্রকিশোরের প্রতিভার সঙ্গে তার ভগবদভক্তির উত্তরাধিকারিণী হয়েছিলেন। 'পথের আলো' আর তার ইংরেজি অনুবাদ 'Leading Lights' এই দুটি বইয়ে তার ধর্মীয় উপলব্ধির কথা লিখেছেন। পরমের এই সাধনার পাশাপাশি তার আর এক মুক্তির জগৎ ছিল (সাহিত্যে জগৎ ব্যতীত)। কটকে তিনি 'শিশু ও মাতৃমঙ্গলকেন্দ্র' গড়ে তোলেন। 'উড়িষ্যা নারীসেবা সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। মহাযুদ্ধে আহতদের সেবার দায়িত্ব কাধে নিয়ে রেড ক্রস সেবক বাহিনী গঠন করেন। 'কাইজার এ হিন্দ' পদক (১৯৪৫-৪৬) তার সেই সেবারই স্বীকৃতি। তার 'নিজে পড়' গ্রন্থটি শিশুসাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং এর জন্য তিনি 'লেখিকা' পুরস্কার ও ভারত সরকারের 'সাহিত্য' পুরস্কার' (১৯৫৬) লাভ করেন। সংসার করেও কিভাবে সাংসারিকতায় নিমাজ্জিত না থাকা যায়, সুখলতা রাও যেন সারাজীবন ধরে সেটাই দেখিয়েছেন। লীলা

মজুমদারের বর্ণনায় দেখি নিপুনা গৃহিনী হলেও তিনি একটুও সংসারী ছিলেন না। চমৎকার রান্না করতেন, অতিথি সেবা করতেন, ঘর সাজাতেন। কিন্তু তার মনে থাকত লেখায় ও ছবি আকায়।

সুখলতার প্রায় প্রতিটি রচনাতেই তার বাস্তববাদী সুচিন্তিত মননধর্মের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। শিশুদের বর্ণ পরিচয় করানোর ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিজ্ঞানসম্মত পথের হদিশ দিয়েছেন। প্রচলিত বর্ণমালার ক্রমানুসারে না সাজিয়ে তিনি বর্ণগুলিকে তাদের চেহারার সাদৃশ্য অনুসারে সাজিয়েছেন। যাতে ছোটরা সহজেই একটি বর্ণ শিখে তার সাদৃশ্যে অন্য বর্ণগুলিও সহজভাবে শিখে নিতে পারে। এইভাবে একটি শিশুর পক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষালাভ অনেকটাই সহজ-সরল ও আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন।

সুখলতা ছোটদের জন্য নানা স্বাদের গল্পের বইও লিখেছেন। 'আলি ভুলির দেশে', 'নানান গল্প', 'খোকা এল বেরিয়ে' প্রভৃতি বইয়ে প্রকাশিত গল্পগুলির আবেদন চিরন্তন। 'আলি ভুলির দেশে' গল্পের ছোটদের মনের কল্পনার অপ্রুপ জগৎজীবন্ত হয়ে উঠেছে লেখিকার আন্তরিক স্নেহস্পর্শে। গল্পে দেখা যায়, পড়ার সময় আলি ভুলিরা দেশে যাবার জন্য তার পড়া হয়নি। তার মা তার উপর রাগ করলেন, শাস্তিও দিলেন। তাই ননুর স্থির করেছে –

> "এবার থেকে পড়ার সময় যদি আলি ভুলিরা ডাকতে আসে তাদের সঙ্গে যাবে না, খালি খেলার সময় যাবে।"[১২]

এই গল্পে একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে শিক্ষামূলক বিষয় ও অপার আনন্দ।

দেশি-বিদেশি নানা রূপকথা-উপকথার গল্প সংকলনের পাশাপাশি সুখলতা দেশ-বিদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের মজার ছড়া-কবিতাও সংগ্রহ করেছিলেন। 'নূতন ছড়া' বইয়ে দেখা যায় অধিকাংশই ইংরেজি ছেলেভুলানো ছড়ার অনুবাদ। ছড়াগুলি তিনি অনুবাদ করতে গিয়ে সুখলতা বিদেশি ছড়ার মূলভাব ও ছন্দ বৈশিষ্ঠ্যকে এক রেখে সেগুলিকে যথাসম্ভব দেশীয় ছাঁদে ঢেলে সাজিয়েছেন। অন্যদিকে, এদেশীয় লোকজ ছড়াগুলি নিয়েও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তিনি। ছড়া গুলিকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন না করে ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিশেষের সংযোজন ঘটিয়েছেন। যেমন- উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, প্রকৃত ছেলে ভুলানো ছড়ায় আছে–

"সূয্যিমামা সূয্যিমামা, রোদ করো না,
তোমার শাশুড়ী বলে গেছে বেগুন কোট না;
বেগুন হল চাকা চাকা, বৌ হল খাদা নাকা;
বড় মরায়ে হাত দিয়ে, ছোট মরায়ে প দিয়ে,
আয় সূয্যি ঝলমলিয়ে!"[১৩]

সুখলতা এই ছন্দেই লিখলেন–

"সূয্যিমামা, সূয্যিমামা
রোদ কর'সে।
বানে রাজ্যি যায় সে ভেসে
পান কর সে।
খেতের জলে লাগুক টান,
পাকুক গম, পাকুক ধান।
বড় মরা ইয়ে দুই পা দিয়ে,
ছোত মরাইয়ে হেলান দিয়ে,
আয় সূয্যি ঝলমলিয়ে।"[১৪]

এই সমস্ত ছড়াগুলি পুরাতন, পরিচিত। কিন্তু নতুনত্বের স্বাদে ও আনন্দে ভরা। আধুনিক জীবনবোধ গড়া।

ছোটদের জন্য সুখলতা বেশ কিছু মজার মজার কবিতা ও লিখেছেন। কোনও কোনও কবিতায় আছে নিটোল গল্প কাহিনীর স্বাদ। 'টুনির বাসা' কবিতাটি পড়তে পড়তে মনে পড়ে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সেই 'টুনটুনি আর বিড়ালের কথা'। আবার 'গোষ্ঠজানা' কবিতায় রাতের অন্ধকারে হারানো বাছুর খুজতে গিয়ে ভুল করে গোষ্ঠ জানা ধরে এনেছে এক বাঘের ছানা–

"সেথা ঝোপের কাছে

বাছুর আছে
অস্পষ্ট দেখতে পেল।
তারে জাপটে ধরে
আনল ঘরে
চ্যাচায় সবে– 'এ কিএ, জানা?'
শুনে চাহিতে কোলে
পড়ে সে ঢলে
এনেছে ভুলে বাঘের ছানা।"[১৫]

এমনই অনাবিল হাসি আর মজার খোরাক রয়েছে, 'উৎপাত', পিঠে', চাদেঁর বাতি' প্রভৃতি কবিতায়। অন্যদিকে 'টেলিফোন মাহাত্ম্য' কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে মনোরম এক ছবি –

"ছোট আজ্ঞে বলে
'আজ্ঞে' 'আজ্ঞে' করে
সাড়া দিয়ে জোরে জোরে
টেবিলের নীচে খোজে
পরদাটা ধরে খিঁচে,
আলমারি ঘুরে পিছে,
দ্যাখে সেথা নেই নেই।
কোথা ও বাবু নেই।
টেলিফোন বেজে চলে।"[১৬]

অবশ্য সুখলতা রাওয়ের কবিতার পাশাপাশি গল্প উপন্যাসগুলিও ছোটদের হৃদয়গ্রাহী। এরকমই উপন্যাস হল 'অনুসন্ধান' যেখানে রয়েছে দুই ভাই সুজিত ও সুচিতের কাহিনী। জানা যায় শৈশব ঘটনাচক্রে নিজের বাবা–মা–ভাই-বোনের কাছ থেকে পৃথক হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে সূচিত 'মনীন্দ্র' নামে বড়ো হয়েছে দরিদ্র এক কৃষক পরিবারে। পড়াশুনার জন্য কলকাতায় আসার পর হঠাৎ একদিন কিছু লোক তাকে তুলে নিয়ে যায় কালীকিঙ্কর বাবুর বাড়িতে। সেখানে গিয়ে সে জানে যে তারই মতো দেখতে এই বাড়ির ছেলে সুজিত, যে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। কালীকিঙ্কর বাবু ও তার স্ত্রী তাকে সুজিত বলে মনে করেছে। এরই মাঝে মনীন্দ্র জানতে পারে, তার সঙ্গে চেহারার মিল আছে এমন একটি ছেলে জাহাজে পাড়ি দিয়েছে লন্ডনের উদ্দেশ্যে। মনীন্দ্রও লন্ডনে যায় পড়াশুনার অছিলায়। যদিও তার প্রধান লক্ষ্য ছিল সুজিতের অনুসন্ধান। লন্ডনে ঘটনাচক্রে দুজনের সাক্ষাৎ হলে মনীন্দ্র জানতে পারে, সে আসলে সুজিতের যমজ ভাই সুচিত। উপন্যাসের শেষে দুই-ভাইয়ের মিলনের মধ্যে দিয়ে ঘটেছে সমগ্র কাহিনীর মধুর পরিণাম।

সুখলতা ছিলেন ছোটদের জন্য অত্যন্ত মরমী লেখিকা, ভীষণ আন্তরিক তার উপস্থাপনা। ছোটদের মনের উপযুক্ত খাদ্যের যোগান দিয়েছেন তিনি। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি অবান্তর, অবাস্তব বিষয়কে গ্রহন করেননি তিনি। বরং কীভাবে ছোটদের চারপাশের বাস্তব পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে তোলা যায়, সে বিষয়ে গভীর ভাবে ভেবেছেন। তার গল্প উপন্যাস–ছড়া-কবিতার পাশাপাশি নাটকগুলিতে (বীর হনুমান, পাখির দেশ) দেখা যায় রুচিশীল চিন্তা-চেতনার প্রকাশ।

১৯৫৬ সাল থেকে সুখলতা ও জয়ন্ত রাও কলকাতা নিবাসী হন। 'নিজে শেখ', মাটির মানুষ', 'আলিভুলির দেশে', 'ঈসপের গল্পে'র মতো বহু বই কলকাতায় পূর্বেই বেরিয়েছে। রাষ্টীয় পুরষ্কার ও ভুবনেশ্বরী পদকের মতো সম্মান পেয়েছেন। ১৯৬৫ তে মারা যান জয়ন্ত রাও। ১৯৬৬ তে মারা যান সুখলতা রাও। মৃত্যুর মাসখানেক আগেও লীলা মজুমদারকে বলেছিলেন শেষ না হওয়া লেখার কথা, বলেন–

"যেখানে যা আছে, আর যা কাজে লাগে, দিয়েছে, নষ্ট হলে আমার কষ্ট হবে।"[১৭]

সুখলতা রাও লিখতেন, আর লিখতেন বলেই 'সহজ পাঠ' আর 'হাসিখুশি' র সঙ্গে তার 'নিজে পড়' আর 'নিজে লেখ'– বাংলার সাহিত্যের সাথে সাথে আমাদের শৈশবের সাথে জড়িয়ে আছে। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর বড় মেয়ে বলে নন, সুকুমার রায়ের দিদি বলে নন, সুখলতা তার বহুমখী কাজকর্ম আর লেখালেখির জন্য সাহিত্য, শিশুশিক্ষা আর নারী জগতের ইতিহাসে স্ব মহিমায় উজ্জ্বল।

তথ্যসূত্র :

১. রাও, সখলতা, 'বাবা' প্রবন্ধ, সুখলতা রাও রচনাসংগ্রহ (৩), থীমা প্রকাশনী, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা – ২৬, প্রথম প্রকাশঃ ২০০৪, পৃ. ২৬৬
২. তাদেব, পৃ. ২৬৫
৩. রাও, সুখলতা, 'আমার মাসিমা সুখলতা রাও'; সুখলতা রাও রচনা সংগ্রহ (১), থীমা প্রকাশনী, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা- ২৬. প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৯ পৃ. ৩
৪. রাও, সুখলতা, 'বাবা' প্রবন্ধ, সুখলতা রাও রচনা সংগ্রহ (৩) থীমা প্রকাশনী, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা – ২৬, প্রথম প্রকাশঃ ২০০৪, পৃ. ২৬৬
৫. তদেব, পৃ. ২৬৫
৬. তদেব, পৃ. ২৬৫
৭. আনন্দবাজার প্ত্রিকা, শনিবার ২৩ মার্চ ২০১৯, পৃ.২
৮. রাও, সুখলতা, 'শিশু সাহিত্যে সুরুচি', সুখলতা রাও রচনা সংগ্রহ (১), থীমা প্রকাশনী, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা- ২৬, প্রথম প্রকাশঃ১৯৯৯, পৃ. ১৯
৯. রাও, সুখলতা, 'আমার মাসিমা সুখলতা রাও'; সুখলতা রচনা সংগ্রহ (২) থীমা প্রকাশনী, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা- ২৬, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৯। পৃ. ৩
১০. তদেব, পৃ. ৫
১১. তদেব, পৃ. ৫
১২. রাও, সুখলতা, 'আলিভুলির দেশে', সুখলতা রাও রচনা সংগ্রহ (২) থীমা প্রকাশনী, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা- ২৬. প্রথম প্রকাশ ঃ ২০০০. পৃ. ৪৭
১৩. 'ছেলেভুলান ছড়া; 'সূয্যিমামা'- ছড়া
১৪. রাও সুখলতা, কিশোর গ্রন্থাবলী, ছড়া– ২, পৃ. ৮৬
১৫. রাও সুখলতা, কিশোর গ্রন্থাবলী, পৃ. ৭৭
১৬. তদেব, পৃ. ৭৬
১৭. আনন্দবাজার পত্রিকা, শনিবার ২৩ মার্চ, ২০১৯, পৃ. ২